এ-আমল সে-আমল

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥এ-আমল সে-আমল॥

ঠি ক ক ত ব য় সে তা মনে নেই কিন্তু এবারে একটা চাকর পেলেম আমি। চাকরের আসল নামটা শ্রীরামলাল কুণ্ডু, নিবাস বর্ধমান বীরভুঁই। সে কিন্তু বলত তার নাম–ছী আম্‌নাল কুণ্ডু।

ছেলেবেলা থেকে রামলাল ছিল আমাদের ছোটোকর্তার কাছে। ঘুমের আগে খানিক পায়ে সুড়সুড়ি না দিলে ছোটোকর্তার ঘুমই আসত না। সেই মস্ত ভার পেয়েছিল রামলাল। কিন্তু কাজে টিকতে পারলে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা একেবারে সুনিয়মে বাঁধাচালে চলত ছোটোকর্তার কাজকর্ম সমস্তই। নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হলে ছোটোকর্তার মেজাজ খারাপ, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা–এমনি নানা উৎপাত আরম্ভ হত। চাকরদের এই-সব বুঝে চলতে হত, না হলেই তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত! এই-সব নিয়মের গোটা কতক বলি, তা হলে হয়তো বোঝা যাবে কেন, রামলাল ছোটোকর্তার পদসেবা ছেড়ে ছোটোবাবু–আমার কাছে–পালিয়ে এল।

শুনেছি সেকালের বড়ো বড়ো পাথরের গোল টেবিলের বাঁকা পায়াগুলো সইতে পারতেন না ছোটোকর্তা। এক চাকরকে প্রত্যহ তোয়ালিয়া দিয়ে টেবিলের পায়া তিনটিকে ঘোমটা পরিয়ে রাখতে হত, এবং সর্বদা নজর রাখতে হত তোয়ালিয়া বাতাসে সরে পড়ল কিনা। হুঁকোবরদার, তার কাজই ছিল যে প্রথম টানেই সটকা থেকে ধোঁয়া পান যেন কর্তা–একবারের বেশী দু'বার না টান দিতে হয়। দেওয়ালে বাঁকা ছবি থাকলে মুশকিল। ছেলেবেলা থেকে ছোটোকর্তার পা না টিপলে ঘুমই আসত না, সেজন্যে ছিল বিশেষ চাকর, যার হাত পরীক্ষা করে ভর্তি করা হত কাজে–কড়া হাত না হয়। ঘুমের আগে গল্পশোনা, সকালে খবর শোনানো–এমনি নানা কাজে নানা লোক ছিল। সব চেয়ে শক্ত কাজ তার–যাকে বারোমাসই ছোটোকর্তার আছমনের জল দিতে হত। কর্তার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই এক আঁজলা জল চাকরের গায়ে ছিটোতে হবে। তোপ পড়ার সঙ্গে ছোটোকর্তা একবার হাঁচবেনই, যেদিন হাঁচি এল না সেদিন ডাক্তারের ডাক পড়ল।

BANGLADARSHAN.COM

ছোটোকর্তার এই সব অকাট্য নিয়মের কোন্‌টা ভঙ্গ করে যে রামলাল বরখাস্ত হয়েছিল তা সেও বলে নি, আমিও জানি নে। রামলাল যখন এল আমার কাছে তখন সে ছোকরা আর আমি কত বড়ো মনেই পড়ে না, শুধু এইটুকু মনে আছে–আমি ধরা আছি তখনো আমাদের তিনতলার মাঝের হল্‌টাতে। আশপাশের ঘরগুলো থেকে পাঁচ-সাতটা ধাপ উঁচুতে এই হল্‌টা। মস্ত ছাত, বারোটা পল্‌তোলা মোটা মোটা থামের উপর ধরা, থামের মাঝে মাঝে লোহার রেলিঙ। কড়ি, বরগা থাম জানলা দরজার বাহুল্য নিয়ে মস্ত ঘরটা যেন একটা অরণ্য বলে মনে হত। সেকালের বড়ো বড়ো ঝাড় লণ্ঠন ঝোলাবার হুক আর কড়া–সেগুলোকে দেখে মনে হত যেন সব টিকটিকি আর বাদুড় ঝুলে আছে মাথার উপরে–দিনের পর দিন একভাবেই আছে তারা!

এই অনেক দ্বার, অনেক থাম, কড়ি-বরগা, প্রাচীর আর লোহার রেলিঙ ঘেরা স্থানটা, এর মধ্যে মস্ত খাঁচায় ধরা ছোট্ট জীব–খাই দাই আর ঘুমোই। এই খাঁচার বাইরে কী ঘটে চলেছে, কী বা আছে, কিছুই জানার উপায়

নেই। এক-একবার চারদিকের জানলা ক'টা খুলে যায়—আলো আসে, বাতাস আসে, আবার ঝুপঝাপ বন্ধ হয় জানলা—এই করেই জানি সকাল হল, দুপুর এল, বিকেল হল, রাত হল।

সম্পূর্ণ ছাড়া পাই নি তখনো আকাশের তলায়, চলতে ফিরতেও পারি নে ইচ্ছামতো। বাড়ির অন্য অংশগুলো থেকেও আলাদা করে ধরা আছি। দাসী দু-একটা কখনো কখনো বসে এসে ঘরটায়, তাদের দেশের কথা বলাবলি করে, মনিবদের গালাগালি দেয় চুপিচুপি। একটা কালো বেড়াল, রোজই সন্ধ্যায় দেখা দেয়—কী খুঁজতে সে আসে কে জানে—এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। খাট-পালঙগুলো নড়ে না চড়ে না—দিনের বেলায় বালিশ তার তোশকের পাহাড় সাজিয়ে বসে থাকে, আর সন্ধ্যা হলে মশার ভনভনানির মধ্যে ধুনোর ধোঁয়াতে মশারির ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কেমন এক ফাঁকা ফাঁকা ভাব জাগায় আমার মনে এই ঘরটা। বৈচিত্র্য নেই বললেই হয় ঘরটার মধ্যে। করবারও কিছু নেই এখানটায়।

এই অবিচিত্র ফাঁকার মধ্যে রামলাল যখন আমাকে তার বাবু বলে স্বীকার করে নিলে তখন ভারি একটা আশ্বাস পেলেম। মনে আহ্লাদও হল—এতদিনে নিজস্ব কিছু পেলেম আমি। রামলাল আসার পর থেকেই বাড়ির আদব কায়দাতে দোরস্ত হয়ে ওঠার পালা শুরু হল আমার। একজন যে ছোটোকর্তা আছেন, তাঁর যে একটা মস্ত বাড়ি আছে অনেক মহলা, সেখানে যে পূজোয় যাত্রা বসে মথুর কুণ্ডুর—এ-সব জানলেম। অমনি না-দেখা বাড়ি না-দেখা মানুষদের দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হয়ে গেল বাইরেটাতে আর আমাতে। এই সময়টাতেই আরব্য-উপন্যাসের এক টুকরোর মতো এই তিনতলার ঘরটার আগের কথা এবং আগের ছবিটাও পেয়ে গেলাম কার কাছ থেকে তা মনে নেই। এই বাড়িটাকে সবাই ডাকে তখন 'বকুলতলার বাড়ি' বলে। শুনেছি বাড়ি ছিল আগে একতলা বৈঠকখানা। এর দক্ষিণের বাগানে ছিল মস্ত একটা বকুলগাছ—পাঁচপুরুষ আগে সেই গাছের নামে বাড়িখানা 'বকুলতলার বাড়ি' বলে চলছে—আমি যখন এসেছি তখনো! এমনি ছেলেবেলায় চোখে দেখছি যে-মস্ত-হল্‌টাতে একেবারেই ফাঁক, শোনাকথার মধ্যে দিয়ে কল্পনাতে সেই বাল্যকালেই দেখতে পাই হলঘরটাকে সুসজ্জিত, যখন লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন কর্তার কাছে দিনরাত তখনকার আমলে।

BANGLADARSHAN.COM

সেই কালের এই হল্—হল্ বললে ঠিক ভাবটা বোঝায় না—চণ্ডীমণ্ডপ তো নয়ই—বারো দোয়ারী কতকটা আভাস দেয়—কিন্তু ঠিক বুঝি যদি ভেবে নিই, একটা মস্ত জাহাজের ডেক, তিনতলার উপরে, জল্ থেকে তুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রমাণের অতিরিক্ত মোটা মোটা লম্বা কড়ি থাম জানলা দরজা এবং আলো হাওয়া আসবার জন্যে আবশ্যকের চেয়ে বেশি পরিমাণ ফাঁক দিয়ে প্রস্তুত আমাদের এই তিন তলার মাঝের ঘরটা। বাইরেটাকে একটুও না ঠেকিয়ে অথচ বাইরের উৎপাত রোদ, বৃষ্টি, লোকের দৃষ্টি ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ আগলে অদ্ভুত কৌশলে প্রস্তুত করে গেছে ঘরখানা কোন্ এক সাহেব মিস্ত্রি—সেই নেপোলিয়ানের আমলের অনেক আগে।

এই সাহেবকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—পরচুল পরা, বেণী বাঁধা, কাঁসির মতো মস্ত গোল টুপিটা মাথায়, গায়ে খয়েরী রঙের সাটিনের কোট, পায়ে বার্নিশ জুতো বকলস দেওয়া, শর্ট প্যান্ট, হাঁটুর উপর পর্যন্ত মোজায় ঢাকা, গলায় একটা সিল্কের রুমাল ফুলের মতো ফাঁপিয়ে বাঁধা। সাহেব এসে উপস্থিত আমাদের কর্তার কাছে

পাল্‌কি চড়ে। কর্তা সটকায় তখন তামাক খাচ্ছেন হাউসে যাবার পূর্বে। সাহেব মস্ত গোল পাথরের টেবিলে মস্ত একখানা বাড়ির নকশা মেলে ধরেছে, আর একটা পালকের কলমের উলটো দিক নকশার উপরে টেনে টেনে কর্তা সাহেবকে বোঝাচ্ছেন, এ-দেশের নাচঘর, বৈঠকখানা, তাওখানা প্রভৃতির সঠিক হিসেব। কর্তা বসে, সাহেব দাঁড়িয়ে। এখন হেলে একটা মস্ত বেআদবি ঠেকত, কিন্তু তখন এইটেই ছিল চাল এবং চল। সাহেব-ইঞ্জিনিয়ার তখন লিখত নিজের নাম ইংরিজিতে কিন্তু নিজের পেশাটা লেখা থাকত সুন্দর বাংলায়–যেমন 'Mr. George Edwards Eves' উপরে, নীচে লেখা 'গৃহনির্ম্মাণকর্তা।'

কর্তা ছিলেন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী সওদাগর এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে মানমর্যাদার ইয়ত্তা ছিল না কর্ত্তার। সুতরাং তাঁর খাশ মজলিসের স্থানটা কেমনতরো হওয়া উচিত তা যেন সাহেব মিস্ত্রি বুঝে নিয়ে করেছিল সূত্রপাত এই তিনতলার ঘরটার। আলো, বাতাস, জাহাজ, ঘর–সমস্তকে একটা চমৎকার মতলবের মধ্যে সে ঘরে নিয়ে বানিয়ে গেছে।

এই হল্‌–ঐশ্বর্যের গৌরবের জোয়ারের চিহ্ন ধরে ধরে একতলা থেকে যখন উঠল ক্রমে আশি ফুট উপরে তখন পৃথিবীতে আমি নেই, কিন্তু শোনা-কথার মধ্যে দিয়ে তখনকার ব্যাপার যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।–কর্তার খাশ মজলিশ বসেছে রাতের বেলা আমার থেকে চারপুরুষ পূর্বে এই হল্‌টাতে–দক্ষিণের চল্লিশফুট ফালিঘরে পড়েছে সাহেবসুবোর জন্যে রাত্রিভোজের টেবিল অনেকগুলো। টেবিলের উপরে চীনের বাসন থরেথরে সাজানো। সব বাসনেই সোনার জল করা রঙিন ফুলের নকশা। প্রত্যেক বাসনে কর্তার নামের তিনটে অক্ষরের সোনালি ছাপ মারা। ঝকঝক করছে রুপোর সামাদানে মোমবাতি। খানসামা সবাই জরি দেওয়া লাল বানাতের উর্দি-পরা, কোমরে একখানা করে রুমাল।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরের দিকে একটা বারান্দা–সেখানে আহারের পর আরামে বসে তামাক খাবার ব্যবস্থা রয়েছে–সেখানটাতে হুঁকোবরদার বড়ো বড়ো সোনারূপোর সটকাতে তামাক সেজে প্রস্তুত, বড়ো সিঁড়ির উপরে চোবদার খাড়া, আসাসোটা হাতে স্থির যেন পুতুল! মানুষপ্রমাণ উঁচুতে থাম আর রেলিঙঘেরা বড়ো হল্‌–লোকলস্কর থেকে পৃথক-করা উঁচু জায়গাটা ঝাড়ে, লণ্ঠনে, বাতির আলোয় জম্‌জমাট। ঘরজোড়া প্রকাণ্ড একখানা গালিচা–ঘন লাল আর শাদা ফুলের কারিগরি তাতে; ঘরের পুব-পশ্চিম দুটো বড়ো দেওয়ালে দু'খানা বড়ো বড়ো অয়েল পেনটিং–সাহেব ওস্তাদের আঁকা–বরবেশে এই বংশেরই এক ছেলে আর পেশওয়াজ পরা একটি মেয়ে, দু'জনেই হীরে মানিক আর কিংখাবে মোড়া। এই এখন যেমন খোট্টাদের বর-সাজ তেমনি ধরনের সাজসজ্জা দু'জনেরই।

গালিচার উপরে মেহগনি কাঠের বাঘ-থাবা, বাঘমুখো অদ্ভুত গঠনের কৌচ কেদারা তেপায়া, একটার মতো অন্যটা নয়। আরামে বসার জন্যেই তৈরি এইসব কৌচ কেদারায় সেই সেকালের লাট-বেলাট-সাহেব-সওদাগর ও চৌরঙ্গীর বাসিন্দা–তারা বড়ো বড়ো সটকায় তামাক টানছে, আর তয়ফায় নাচ দেখছে গম্ভীর হয়ে বসে। সব সাহেবই পাউডার মাখানো পরচুলধারী। হাতে রুমাল আর নস্যদানী! দু'সারি উর্দিপরা ছোকরা

ক্রমান্বয়ে বড়ো বড়ো পাখার বাতাস দিচ্ছে তাদের, আর মজলিসে রুপোর সালবোটে সোনারুপোর তবক-মোড়া পান বিলি করে চলেছে। আতরদানি গোলাপ-পাশ ফিরিয়ে চলেছে হরকরা তারা।

পাশের একটা খাশকামরা—উত্তর দক্ষিণ ও পুব তিনদিকে খোলা—সেখানে কর্তার সঙ্গে মুরুব্বি সাহেব দু-চারজন বসে। সারি সারি খোলা জানলায় দেখা যায় রাতের আকাশ—যেন কারচোপের বুটি দেওয়া নীল পর্দা অনেকগুলো। পুবের ক'টা জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় খালপারের নারকেল গাছের সারি, তার উপরে চাঁদ উঠেছে—যেন কানা-ভাঙা সোনার একটা আবখোরার টুকরো। পশ্চিমের খোলা জানালায় দেখা যাচ্ছে সেকালের সওদাগরি জাহাজের মাস্তুলগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় করে দাঁড়িয়ে। উত্তরে—সেকালের শহর ও বাড়ির অরণ্য একটা।

যে-তিনতলার উপর উত্তর-পশ্চিম থেকে বয় গঙ্গার হাওয়া, পুব দিয়ে আসে বাদলের ঠাণ্ডা বাতাস, উত্তর জানলায় শীতের খবর আসে, দক্ষিণ বাতায়নে রহে-রহে বয় সমুদ্রের হাওয়া, সেখানটাতে একটা রাত নয়—আরব্য উপন্যাসের অনেকগুলো রাতের মজলিসের আলো, সারিসারি খোলা জানলা হয়ে বাইরে রাতের গায়ে ফেলত একটার পর একটা সোনালি আভার সোজা টান। আর সমস্ত তিনতলাটা দেখাত যেন মস্ত একটা নৌকা অনেকগুলো সোনার দাঁড় কালো জলে ফেলে প্রতীক্ষা করছে বন্দর ছেড়ে বার হবার হুকুম ও ঘণ্টা। এ যারা তখন আশেপাশের বাড়ির ছাতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কর্তার মজলিসের কাণ্ডখানা সত্যি দেখেছে তাদের মুখে শোনা কথা।

BANGLADARSHAN.COM

আমি যখন এসেছি—তখন স্বপ্নের আমল আরব্য উপন্যাসের যুগ বাংলা দেশ থেকেই কেটে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তখন আরম্ভ। 'গুল্‌রকাওলী', 'ইন্দ্রসভা', 'হোমার', এ-সব বইগুলো পর্যন্ত সরে পড়বার জোগাড় করেছে—এইসময় রামলাল চাকরের সঙ্গে বসে দেখি, দুই দেয়ালে দুই সেই সেকালের ছবির দিকে।—বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে ছবির মানুষ দুটি চেয়ে আছে, মুখে দু'জনেরই কেমন একটা উদাস ভাব ছবির গায়ে আঁকা। হীরে-মুক্তোর জড়োয়া সাজসজ্জা যেন কত কালের কত দূরের বাতির আলোতে একটু একটু ঝিকঝিক করছে। আমি অবাক হয়ে এখনো এই ছবি দেখি আর ভাবি কী সুন্দর দেখতেই ছিল তখনকার ছেলেরা মেয়েরা; কী চমৎকার কত গহনায় সাজতে ভালবাসত তারা।

কল্পনা নিয়ে থাকার সুবিধে ছিল না তখন, কেননা রামলাল এসে গেছে এবং আমাকে পিটিয়ে গড়বার ভার নিয়ে বসেছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মেরে-ধরে, এ-বাড়ির আদবকায়দা-দোরস্ত একজন কেউ করে তুলবেই আমাকে, এই ছিল রামলালের পণ! ছোটোকর্তা ছিলের রামলালের সামনে মস্ত আদর্শ, কাজেই এ কালের মতো না করে, অনেকটা সেকেলে ছাঁচে ফেললে সে আমাকে—দ্বিতীয় এক ছোটোকর্তা করে তোলার মতলবে।

ছোটোকর্তা ছুরি-কাঁটাতে খেতেন, কাজেই আমাকেও রামলাল মাছের কাঁটাতে ভাতের মণ্ড গেঁথে খাইয়ে সাহেবী দস্তুরে পাকা করতে চলল; জাহাজে করে বিলেত যাওয়া দরকার হতেও পারে, সেজন্য সাধ্যমতো রামলাল ইংরিজির তালিম দিতে লাগল—ইয়েস নো বেরি-ওয়েল, টেক্ না টেক্ ইত্যাদি নানা মজার কথা।

কোথা থেকে নিজেই সে একখানা বাঁশ ছুলে কাগজে কাপড়ে মস্ত একটা জাহাজ বানিয়ে দিলে আমাকে—সেটা হাওয়া পেলে পাল ভরে আপনি দৌড়োয় মাটির উপর দিয়ে। এই জাহাজ দিয়ে, আর হাঁসের ডিমের কালিয়া দিয়ে ভুলিয়ে, খানিক বিলিতি শিক্ষা, সওদাগরী-ব্যবসা, কারিগরি, রান্না জাহাজ-গড়া, নৌকার ছইবাঁধা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে পাকা করে তুলতে থাকল আমাকে রামলাল।

তিন তলার ঘরটায়—সেখানে বড়ো কেউ একটা আসত না কাছে, থাকত রামলাল তার শিক্ষাতন্ত্র নিয়ে, আর আমি তারই কাছে কখনো বসে, কখনো শুয়ে, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে। সেকালের ঝাড় ঝোলানোর মস্ত হুকগুলো সারিসারি হেঁটমুণ্ড কিম্বাচক চিহ্ন—চেয়ে দেখত রামলালকে আমাকে মেঝের উপর সেই ঘরে। সেখান থেকে ঝাড় লণ্ঠন কার্পেট কেদারার আবরু অনেক কাল হল সরে গেছে।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM